SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বৌদ্ধ অধিবিদ্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের গুরুত্ব—বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তির মধ্যে তুলনাত্মক বিচার

রিয়া ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা:

লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বিষয় সিদ্ধি হয়। এই নিয়মানুবর্তী হয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের লক্ষণ এবং পরে তার প্রমাণ দিয়ে থাকেন। প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে একটি বিষয়ে এরা সকলেই একমত—প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের ভিত্তি। বৌদ্ধ মতে প্রমাণ দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। আমরা জানি, বৌদ্ধ দর্শন- সম্প্রদায়ের সংখ্যা বহু। তাদের মধ্যে আবার চারটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় মুখ্য—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। এদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি প্রত্যক্ষের স্বরূপ নিয়েও এদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। সম্প্রদায় ভেদে বৌদ্ধ দার্শনিকদের সংখ্যাও কম নয়। তাই এক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনধর্মী হয়েছি। ওই সকল বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে তিনজনকে নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে একটি তুলনাত্মক আলোচনা করেছি।

(এক)

বৌদ্ধ মতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।[i] এই দুটি প্রমাণের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। একটি প্রমাণের বিষয়ে অন্য প্রমাণ অনুপ্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ে অনুমান ঢুকতে পারে না, বা অনুমানের বিষয়ে প্রত্যক্ষ ঢুকতে পারে না। এই নিয়মকে বলা হয় 'প্রমাণব্যবস্থা'। জ্ঞানের এই দ্বিবিধ বিষয়কে লক্ষ্য করেই দুটি প্রমাণের অস্তিত্ব বৌদ্ধমতে স্বীকৃত।[ii] অর্থাৎ প্রমেয় দ্বিবিধ হওয়ায় প্রমেয়-গ্রাহক প্রমাণও দ্বিবিধ—'মানং দ্বিবিধং বিষয়দ্বৈবিধ্যাৎ'।[iii] জ্ঞানের এই দ্বিবিধ বিষয়ের একটি হচ্ছে জ্ঞানে প্রকাশিত বস্তুর নিজের অসাধারণ রূপ, আর অন্যটি হচ্ছে বস্তুর সামান্য রূপ। বস্তুর অসাধারণ রূপকে বলা হয় 'স্বলক্ষণ', আর বস্তুর সামান্য রূপকে বলা হয় 'সামান্যলক্ষণ'।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় কেবল স্বলক্ষণই হতে পারে, অন্য কিছু নয়।[iv] 'স্ব' এবং 'লক্ষণ'—এই দুটি শব্দ নিয়ে স্বলক্ষণ শব্দটি গঠিত। 'স্ব' মানে অসাধারণ অর্থাৎ একান্তভাবে নিজের, আর 'লক্ষণ' মানে তত্ত্ব।[v] তাহলে স্বলক্ষণ মানে হল একান্তভাবে নিজের তত্ত্ব। দুর্বেকমিশ্র 'স্ব' শব্দটিকে এভাবে ভেঙ্গেছেন—'যস্য যৎ স্বং তৎ তস্যৈব নান্যস্যেতি লক্ষণয়া স্বশব্দেন অসাধারণম্ উক্তম্'। অর্থাৎ যার যেটি স্ব সেটি তারই, অন্যের নয়—এইভাবে লক্ষণার দ্বারা 'স্ব' শব্দের অর্থ অসাধারণ বলা হয়েছে। ধর্মোত্তরের মতে 'স্বলক্ষণ' শব্দের অর্থ 'তৎ-মাত্রত্ব' বা 'ব্যক্তিমাত্রত্ব'। জগতের প্রতিটি বস্তুর স্বরূপ অন্যব্যাবৃত্ত হওয়ায় কোনো বস্তুই অন্য কারুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ভামতীকারের মতে, 'স্বম্ অসাধারণম্ অন্যতো ব্যাবৃত্তং লক্ষণম্' অর্থাৎ অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত নিজের যে অসাধারণ লক্ষণ, তাই স্বলক্ষণ। এককথায়, যা স্বভিন্ন সকল বস্তু থেকে স্বতন্ত্র, তাই স্বলক্ষণ। যেমন- একটি বিশেষ ঘটের যে বিলক্ষণ নিজস্ব রূপ যা তাকে অন্য সব ঘট থেকে আলাদা করে, তাকে ঐ ঘটের অসাধারণ রূপ বা স্বলক্ষণ বলা হয়। এই স্বলক্ষণ হল অনারোপিত বিষয়। আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর *ন্যায়বিন্দু* গ্রন্থের ত্রয়োদশ সূত্রে

স্বলক্ষণের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এভাবে, 'যস্যার্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাসভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্'। অর্থাৎ যে বস্তুটি কাছে বা দূরে অবস্থানের জন্য জ্ঞানের প্রতিভাসের ভেদ হয়, সেই বস্তুই স্বলক্ষণ।[vi] জ্ঞানের বিষয় যে বস্তুটি, সেটি যখন কাছে থাকে তখন জ্ঞানপ্রতিভাস স্ফুট হয়, আর যখন দূরে থাকে তখন জ্ঞানপ্রতিভাস অস্ফুট হয়। তবে কাছে বা দূরে অবস্থানের ফলে জ্ঞানপ্রতিভাসের স্ফুটতার ভেদ হলেও অর্থক্রিয়াকারিত্বের কোন ভেদ হয়না। 'অর্থক্রিয়া' বলতে বোঝায় অর্থস্য ক্রিয়া, অর্থের ক্রিয়া। *ন্যায়বিন্দুটীকা*-তে 'অর্থ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'প্রয়োজন' আর 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'নিষ্পত্তি'।[vii] তাহলে 'অর্থক্রিয়া' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় 'প্রয়োজন নিষ্পত্তি'। বৌদ্ধমতে যা অর্থক্রিয়াসমর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন-নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে, তাই পরমার্থসৎ।[viii] একমাত্র স্বলক্ষণ বস্তুই অর্থক্রিয়াকারী বলে সৎ। প্রত্যক্ষের দ্বারা আগুনের যে ক্ষণিক রূপ আমরা দেখি, আগুনের সেই রূপই দাহ, পাক ইত্যাদি ঘটাতে পারে। আগুনের জাজ্বল্যমান রূপই জ্ঞান-প্রতিভাসের ভেদ ঘটাতে পারে বলে এই রূপই অর্থক্রিয়াসমর্থ। তাই প্রত্যক্ষের বিষয় এই জাজ্বল্যমান রূপই পরমার্থসৎ স্বলক্ষণ। কোন বিশেষ ক্ষণের একটি বস্তু অর্থক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা স্বলক্ষণ হতে পারে, কিন্তু সামান্যভাবে বস্তুকে স্বলক্ষণ বলা চলে না। সামান্য বহ্নি দাহ বা পাক—কোন অর্থক্রিয়াই করতে পারে না। অনুমানের দ্বারা যে বহ্নিকে জানা যায়, সেই বহ্নি কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক জ্ঞানপ্রতিভাসের কোন ভেদ হয় না, তাই অনুমেয় বহ্নি কখনো স্বলক্ষণ হতে পারে না, তা হল সামান্যলক্ষণ। স্বলক্ষণ ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হল সামান্যলক্ষণ।[ix] ধর্মোত্তর 'সামান্যলক্ষণ' শব্দটিকে এইভাবে ভেঙ্গেছেন—'সামান্যেন লক্ষণম্' অর্থাৎ বস্তুসন্তানগুলির মধ্যে বস্তুর সাধারণ যে রূপ, তাই সামান্যলক্ষণ।[x] আমরা যখন ঘটাদি বস্তুকে দেখি, তখন উৎপন্ন জ্ঞানে বস্তুর রঙ, আকার ইত্যাদির সাথে নামটাও প্রতিভাসিত হয়। জ্ঞানে প্রতিভাসিত এই রূপগুলি সমস্ত ঘটের সাধারণ বা সামান্যরূপ। ঘটের প্রকৃত স্বরূপ হল এটি আলাদা একটি বস্তু নয়, পরমাণুপুঞ্জমাত্র। দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গাছকে যেমন একটি বন বলে মনে হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুকে আমরা অজ্ঞানবশতঃ একটা স্থূল বস্তু বলে মনে করি। সুতরাং ঘট-পটাদিকে যে বড় স্থূল বস্তু বলে মনে হয়, তা প্রাতিভাসিক জ্ঞানমাত্র। এরূপ জ্ঞান কখনো প্রত্যক্ষ হতে পারে না। আবার একটি বস্তু অনেকক্ষণ ধরে বর্তমান—এইজাতীয় জ্ঞানও প্রাতিভাসিক। প্রকৃতপক্ষে ঘট-পটাদি প্রতিটি বস্তুই ক্ষণিক। প্রতিক্ষণে বস্তু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ঘটের প্রথমক্ষণটি পরবর্তী ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয়ক্ষণে পূর্ব ঘটের নাশ এবং পূর্ব ঘটের মতো আরেকটি ঘট উৎপন্ন হয়। এইভাবে ঘট কখনো দ্বিক্ষণস্থায়ী হতে পারে না। অথচ আমরা মনে করি ঘটটি অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে। বস্তুতঃ ঐ ক্ষণগুলি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এই ক্ষণপ্রবাহকে বা ক্ষণসন্তানকে এক মনে করে আমরা ঘটকে স্থির বলে ভাবি। এই ঘটসন্তান গুলির মধ্যে ঘটের যে সাধারণ রূপ, সেটাই হল সামান্যলক্ষণ। এই সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, এটা হল অনুমানের বিষয়।[xi]

(দুই)

বসুবন্ধুর মতে প্রত্যক্ষ—স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ এই দ্বিবিধ প্রমেয়ের উপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণকে বৌদ্ধগণ স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা প্রমাণাংশ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বসুবন্ধুই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বসুবন্ধু *বাদবিধি* নামে একটি প্রকরণ গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং তাতে বৌদ্ধ মত অনুসারে প্রমাণগুলি আলোচনা করেছিলেন এরূপ জনপ্রবাদ আছে। যদিও আচার্য দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুকে *বাদবিধি*-র প্রণেতা বলে স্বীকার করেন নি। যাই হোক, *বাদবিধি*-তে উক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি যে বসুবন্ধুসম্মত, তা দিঙ্‌নাগের সময়ও প্রচলিত ছিল। *বাদবিধি* গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ততোঽর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' অর্থাৎ অর্থ বা বিষয় থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।[xii] আচার্য দিঙ্‌নাগ তাঁর *প্রমাণসমুচ্চয়* গ্রন্থে এই লক্ষণটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, নিশ্চয়াত্মক বিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে বিষয়ের জ্ঞানরূপে ব্যবহৃত, বাস্তবিক বিজ্ঞান যদি কেবল সেই বিষয়ের দ্বারাই উৎপন্ন হয়, অন্যের দ্বারা নয়, তাহলে উৎপন্ন জ্ঞানটি হবে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান।[xiii]

বৌদ্ধমতে যা অর্থক্রিয়াসমর্থ তাই সৎ হওয়ায় বস্তুর অর্থক্রিয়াসামর্থ্যকেই তাঁরা বস্তুর সত্তা বলেছেন। সর্বসাধারণ কোন জাতি বা ধর্ম তাঁরা স্বীকার করেন নি। দ্বিবিধ বস্তুর মধ্যে একমাত্র স্বলক্ষণ বস্তুই স্ববিষয়ক জ্ঞানে আকার সম্পাদন করে অর্থক্রিয়াসমর্থ অর্থাৎ সৎ হয়। সামান্যলক্ষণ বস্তু স্ববিষয়ক জ্ঞানে আকার সম্পাদন করে না। অনুমিত্যাত্মক বিকল্প জ্ঞানের যে সামান্যাকার, বিষয়গুলি তার সমর্পক নয়। পরন্তু, কারণীভূত যে ব্যাপ্ত্যাদি-নিশ্চয়, তা ঐ সকল জ্ঞানে আকার সমর্পণ করে থাকে। বৌদ্ধমতে কোন বিকল্প প্রতীতিতে বিষয়ের কারণতা নাই, তা থাকতেও পারে না। কারণ বিকল্প প্রতীতির বিষয়গুলি অসৎ বা অলীক হওয়ায় এদের দূরত্ব-সামীপ্যের প্রশ্নই ওঠে না, আকার সম্পাদন তো বহু দূরে। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই এটা দেখা যায় যে, বিষয়ের নৈকট্যবশতঃ জ্ঞান বিশদ বা সুস্পষ্ট হয় এবং বিষয়ের দূরত্বে জ্ঞান অবিশদ বা অস্পষ্ট হয়। আকারের তারতম্যের ফলে জ্ঞানের বৈশদ্যাবৈশদ্য সংঘটিত হয়ে থাকে, এবং বিষয়ের নৈকট্যাদি তারতম্যের ফলে আকারের তারতম্য ঘটে। এই কারণে বৌদ্ধরা কেবল প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানে প্রত্যক্ষের বিষয়গুলিকেই আকারদাতা বলে স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে স্বলক্ষণ বিষয়গুলি যদি আকার সমর্পণ না করতো, তাহলে বিষয়ের নৈকট্য বা দূরত্বে জ্ঞানীয় আকারের বৈশদ্যাবৈশদ্য সংঘটিত হত না।

সামান্যলক্ষণরূপ বিষয়গুলি নিকটে থাকলে অনুমিত্যাত্মক বিকল্প বিজ্ঞান যেরূপ নিশ্চয়াত্মক হয়, বিষয়গুলি দূরে থাকলেও অনুমিত্যাত্মক বিকল্প বিজ্ঞান সেইরূপ নিশ্চয়তা নিয়েই সমানভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শব্দাদি অন্যান্য বিকল্প বিজ্ঞানগুলিতেও একই যুক্তিতে নিজ বিষয়ের আকারদাতৃত্ব নেই বলে বুঝতে হবে। কারণ, প্রথমত, বিকল্প বিজ্ঞানের সামান্যলক্ষণাদিরূপ বিষয়গুলি অলীক; দ্বিতীয়ত, বিষয়ের দূরত্ব-নিকটত্বে কল্পনার কোন তারতম্য হয় না।

যাই হোক, জ্ঞান ও বিষয়ের উক্ত প্রকার স্বরূপ পর্যালোচনা করে কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ করতে গেলে বলতে হয় 'স্বপ্রদর্শিত-বিষয়জন্যত্ব'ই প্রত্যক্ষের লক্ষণ। ঘট বিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এরূপ চাক্ষুষজ্ঞানকে 'স্ব' পদে বুঝতে হবে। স্বপ্রদর্শিত-বিষয় হল স্বলক্ষণ ঘট। এই স্বলক্ষণ-ঘটরূপ বিষয়জন্যত্ব স্বাত্মক চাক্ষুষজ্ঞানে আছে। যেহেতু ঐ জ্ঞানে বিষয় স্বলক্ষণ-ঘটটি আকার সমর্পণ করছে। অনুমিত্যাদি বিকল্প জ্ঞানের বিষয় অলীক সামান্যলক্ষণ হওয়ায় এবং অলীকের আকার সম্পাদকত্ব না থাকায় অনুমিত্যাদি বিকল্প জ্ঞানে 'স্বপ্রদর্শিত-বিষয়জন্যত্ব'রূপ প্রত্যক্ষ লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়না। বস্তুতঃ বাদবিধিস্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'স্বপ্রদর্শিত-বিষয়জন্যত্ব'কেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

দিঙ্‌নাগের মতে প্রত্যক্ষ—মধ্যযুগীয় ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের জনক বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগ তাঁর *প্রমাণসমুচ্চয়* গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম্' অর্থাৎ যে জ্ঞান কল্পনারহিত, যে জ্ঞানে নাম, জাতি ইত্যাদির যোজনা হয়না, সেই জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ।[xiv] প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটিতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষ বলতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেই বুঝিয়েছেন। কারণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেই শুধুমাত্র নাম, জাতি ইত্যাদির যোজনা হয়না। এই লক্ষণের লক্ষ্য হল 'প্রত্যক্ষম্', লক্ষণ হল 'কল্পনাপোঢ়ম্',[xv] আর 'নামজাত্যাদ্যসংযুতম্' পদটি কল্পনাপোঢ়-এর অর্থকেই বহন করে। যা প্রত্যক্ষ তা বাস্তবিকপক্ষে কল্পনাপোঢ় হলেও, নর ও মানুষ এই দুটি পদের মতো প্রত্যক্ষ ও কল্পনাপোঢ় এই দুটি পদ পর্য্যায়াত্মক নয়। এখানে প্রত্যক্ষ পদটির দ্বারা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আশ্রিতত্ব-রূপে এবং কল্পনাপোঢ় পদটির দ্বারা কল্পনাপোঢ়ত্ব-প্রকারে একই বিজ্ঞানরূপ অর্থ কথিত হয়েছে। সুতরাং একই অর্থের উপস্থাপক হলেও পদ দুটি বিভিন্ন প্রকারে অর্থের উপস্থাপক হওয়ায় পর্য্যায়াত্মক হয় নাই, পরন্তু উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবাপন্ন একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করেছে। উদাহরণস্বরূপ—'গৌঃ গলকম্বলবান্' বাক্যটিতে 'গৌঃ' ও 'গলকম্বলবান্'—পদ দুটি একই অর্থ উপস্থাপন করে। কারণ যা গো, তাই বাস্তবিকপক্ষে গলকম্বলবান্ হয়। গো থেকে গলকম্বলবান্ অর্থটি আলাদা নয়। কিন্তু তবু এরা পর্য্যায় শব্দ নয়, কারণ 'গো' পদটি অর্থের উপস্থাপনা করে গোত্বরূপে এবং 'গলকম্বলবান্' পদটি অর্থের উপস্থাপনা করে গলকম্বলবত্ত্বরূপে।

তবে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করেছে এই পদ দুটি। একইভাবে, 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্' এই স্থলেও প্রত্যক্ষ ও কল্পনাপোঢ় এই দুটি পদ মিলিতভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করেছে।

যে পদটি সাধারণতঃ বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়সম্মত-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে, তাকে উদ্দেশ্যবোধক পদ, এবং যা স্বসম্মত-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে, তাকে বিধেয়বোধক পদ বলে। প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষত্বটি বৌদ্ধ এবং তদ্ ভিন্ন, এই উভয় মতেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্ব কেবল বৌদ্ধরাই স্বীকার করেন, অন্যরা নয়। সুতরাং আচার্য দিঙ্নাগ ইন্দ্রিয়সাপেক্ষত্ব বা ইন্দ্রিয়াশ্রিতত্ব-প্রকারে প্রত্যক্ষ পদের দ্বারা লক্ষ্যের নির্দেশ করে তাতে নিজসম্মত যে কল্পনাপোঢ়ত্বরূপ লক্ষণ, তার বিধান করেছেন।

দিঙ্নাগের কল্পনাপোঢ়ত্বরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণটি বুঝতে হলে আমাদের আগে কল্পনা ও অপোঢ়ত্বের স্বরূপটি বুঝতে হবে। যদি বলা হয়, কল্পনার স্বরূপ বোঝা তো অতি সরল, কেননা বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ছাড়া সমস্ত জ্ঞানই কল্পনা। সুতরাং, প্রত্যক্ষভিন্ন যে জ্ঞান, তাই কল্পনা হবে। এই কল্পনা যাতে নাই তাই কল্পনা-অপোঢ়। এই যে কল্পনা-অপোঢ়ত্ব, এটাই প্রত্যক্ষের দিঙ্নাগ-সম্মত লক্ষণ। কিন্তু এরূপ কল্পনা-অপোঢ়ত্ব প্রত্যক্ষের লক্ষণ হতে পারে না। কেননা তাহলে জ্ঞপ্তিতে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষ ঘটে। প্রত্যক্ষভিন্ন-জ্ঞানত্বকে কল্পনা বললে কল্পনার জ্ঞানে প্রত্যক্ষের জ্ঞান আবশ্যক হয়ে যায় এবং ঐ কল্পনার অপোঢ়ত্বটি প্রত্যক্ষে প্রবিষ্ট থাকলে প্রত্যক্ষের জ্ঞানে আবার কল্পনার জ্ঞান আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং, কল্পনার বোধে প্রত্যক্ষের বোধ এবং প্রত্যক্ষের বোধে কল্পনার বোধ অপেক্ষিত হওয়ায় তা জ্ঞপ্তি অংশে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষে দুষ্ট হয়ে গেছে।

এই কারণে আচার্য দিঙ্নাগ *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*-তে কল্পনার স্বরূপ প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছেন, অর্থের সঙ্গে নাম-জাতি ইত্যাদির যোজনাই হল কল্পনা।[xvi] 'ডিত্থ' প্রভৃতি সংজ্ঞা-শব্দস্থলে অর্থে সংজ্ঞার যোজনা, 'গো' প্রভৃতি জাতি-শব্দস্থলে অর্থে গোত্বাদি জাতির যোজনা, শুক্লাদি গুণ-শব্দস্থলে অর্থে শুক্লত্বাদি গুণের যোজনা, পাচকাদি ক্রিয়া-শব্দস্থলে অর্থে পাকাদি ক্রিয়ার যোজনা এবং দণ্ডী, বিষাণী ইত্যাদি দ্রব্য-শব্দস্থলে অর্থে দণ্ড, বিষাণাদি দ্রব্যের যোজনা হয়।[xvii] এই যে যোজনা বা অর্থে নাম-জাত্যাদির সম্বন্ধই কল্পনা।

তাই দিঙ্নাগের মতে কল্পনা পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কল্পনা হল—নামকল্পনা, জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা ও দ্রব্যকল্পনা। দেবদত্ত ইত্যাদি নাম যোজনা যে জ্ঞানে থাকে ('ইনি দেবদত্ত' এইভাবে যে জ্ঞান হয়), সেই জ্ঞানকে নামকল্পনা বলা হয়। গো ইত্যাদি জাতির যোজনা যে জ্ঞানে থাকে ('এটি গো' এইভাবে যে জ্ঞান হয়), সেই জ্ঞানকে জাতিকল্পনা বলা হয়। গচ্ছতি ইত্যাদি ক্রিয়া যোজনা যে জ্ঞানে থাকে (রামঃ গচ্ছতি, রাম যাচ্ছে), সেই জ্ঞানকে ক্রিয়াকল্পনা বলা হয়। শুক্ল ইত্যাদি গুণের যোজনা যে জ্ঞানে থাকে, সেই জ্ঞানকে গুণকল্পনা বলা হয়। দণ্ডী (দণ্ড আছে যার) ইত্যাদি দ্রব্যের যোজনা যে জ্ঞানে থাকে, সেই জ্ঞানকে দ্রব্যকল্পনা বলা হয়। যোগাচারবাদী দিঙ্নাগের এই কল্পনা হল গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপ বিকল্প।

'অপোঢ়' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দিঙ্নাগ বলছেন, যে জ্ঞান এরূপ কল্পনার অত্যন্তাভাববান্ সেই জ্ঞানই কল্পনাপোঢ়। সুতরাং দিঙ্নাগের ব্যাখ্যা অনুসারে কল্পনার অর্থাৎ নাম-জাত্যাদি যোজনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব তাই প্রত্যক্ষ।[xviii] কিন্তু প্রদর্শিত লক্ষণটিকে কখনই আমরা সমীচীন মনে করতে পারি না। অর্থগত যে নামাদি-সম্বন্ধ-রূপ কল্পনা, তা অর্থে থাকে, জ্ঞানে থাকে না।[xix] সুতরাং উক্ত লক্ষণটি অনুমিতি ইত্যাদি জ্ঞানান্তরে অতিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনুমিতি ইত্যাদি জাতীয় জ্ঞানেও নাম-জাত্যাদি যোগের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তা আছে।

আমাদের মনে হয়, 'নামজাত্যাদিযোজনা' এই *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি* গ্রন্থস্থ যোজনা পদটি যোগরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। কারণ বৌদ্ধরা অর্থের সঙ্গে শব্দের কোনো স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, বরং ন্যায়াদি সম্মত যে শব্দার্থের

বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ তার খণ্ডন করেছেন বৌদ্ধগণ।[xx] সুতরাং, অর্থে নামজাত্যাদির সম্বন্ধ আছে বলে যে জ্ঞান প্রকাশ করে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অর্থে নামজাত্যাদির সম্বন্ধ না থাকলেও যে জ্ঞান ঐরূপ অসৎ সম্বন্ধের প্রকাশ করে, সেইরূপ জ্ঞানত্বই যোজনা পদের অর্থ। ঐ যোজনারূপ যে জ্ঞানত্ব তাই কল্পনা। এই কল্পনা বা যোজনা যাতে নেই অর্থাৎ এই যোজনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞান, তাই প্রত্যক্ষ।

শান্তরক্ষিত তাঁর *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থে দিঙ্‌নাগের *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি* গ্রন্থস্থ 'নামজাত্যাদিযোজনা' পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমতঃ নামযোজনা ও জাত্যাদিযোজনা এই দুই রূপে উক্ত গ্রন্থের ভাগ করেছেন। পরে প্রথমভাগ যে নামযোজনা তাকেই কল্পনা শব্দটির ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করেছেন, এবং 'নামাদীনাং যোজনা যতো ভবতি' এইপ্রকারে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি করেছেন।[xxi] অতএব, এই মতেও অভিলাপিনী, অর্থাৎ বাচক শব্দের সাথে অর্থের সম্বন্ধপ্রকাশক যে প্রতীতি, তাই যোজনা বা কল্পনা হবে। এই কল্পনা বা যোজনা যাতে নাই, এমন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।

কিন্তু এইপ্রকারে কল্পনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাকেও প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ অনুমিত্যাদ্যাত্মক কল্পনা-জ্ঞানে তা অতিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অনুমিতি ইত্যাদি জ্ঞানগুলি নিজেরা কল্পনাস্বভাব হলেও কল্পনাত্মক জ্ঞানের আধার বা আশ্রয় হয় না। এজন্য কল্পনার বা যোজনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তা ঐ জ্ঞানে আছে।[xxii] এই কারণে দিঙ্‌নাগের *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি* অনুসারে 'অপোঢ়' পদের অত্যন্তাভাববান্ অর্থ না করে অন্যোন্যাভাববান্ অর্থ গ্রহণ করা হল। সুতরাং কল্পনার অন্যোন্যাভাব বা ভেদবিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাই বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ। এখন আর অনুমিতি ইত্যাদি জাতীয় জ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ কল্পনা বা যোজনাস্বভাব যে ঐ সব জ্ঞান, তাতে কল্পনার ভেদ নেই। সুতরাং 'কল্পনাভেদবিশিষ্ট-জ্ঞানত্ব'রূপ যে লক্ষণটি, তা এদের মধ্যে থাকবে না। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানগুলি অকল্পনাস্বভাব হওয়ায় ঐ সকল জ্ঞানে 'কল্পনা বা যোজনার ভেদবিশিষ্ট জ্ঞানত্ব'রূপ লক্ষণটির যথাযথভাবেই সঙ্গতি হল। শান্তরক্ষিতও 'অপোঢ়' পদটির অন্যোন্যাভাববান্-রূপ অর্থই গ্রহণ করেছেন। শান্তরক্ষিতের মতে 'যত্রৈষা কল্পনা নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষম্'—এরূপ উক্তির দ্বারা দিঙ্‌নাগ কল্পনা এবং প্রত্যক্ষ এই দুয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যের নিষেধ করেছেন।[xxiii]

আচার্য দিঙ্‌নাগ তাঁর *ন্যায়প্রবেশ* বা *ন্যায়মুখ* নামক প্রকরণে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং যজ্‌জ্ঞানমর্থে রূপাদৌ নামজাত্যাদিকল্পনারহিতং তদক্ষমক্ষং প্রতি বর্ত্তত ইতি প্রত্যক্ষম্'। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় হরিভদ্র বা তদ্‌ব্যাখ্যায় পার্শ্বদেব যা বলেছেন, তা লক্ষণ নির্মাণের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নি। তাঁরা কল্পনার স্বরূপটাকে স্পষ্ট করেন নি, এবং 'অপোঢ়' পদের অর্থকেও পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেন নি। ওইসব ব্যাখ্যাগ্রন্থের এটাই তাৎপর্য অর্থ যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্বলক্ষণ ক্ষণই বিষয় হয়, বাচক নাম তাতে বিষয় হয় না। কারণ বাচক নামগুলির স্বলক্ষণ অর্থের সাথে কোন সম্বন্ধই নাই। তাদাত্ম্য বা কার্যকারণভাবই বাস্তবিক সম্বন্ধ, স্বত্বস্বামিত্বাদিরূপ সম্বন্ধগুলি কাল্পনিক। অর্থের সঙ্গে শব্দের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই। অভেদ স্থলেই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়। শব্দ ও বাচ্য অর্থের তাদাত্ম্য থাকলে অগ্ন্যাদি শব্দের উচ্চারণে লোকের মুখ দগ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু বস্তুতঃ তা হয় না। সুতরাং শব্দ ও বাচ্য অর্থের তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ নাই। আবার কার্যকারণভাবসম্বন্ধও এদের মধ্যে থাকতে পারে না। কারণ অতীত যে রামরাবণাদিরূপ অর্থ, তাদের বাচক নামগুলি বর্তমানেও আমরা উচ্চারণের দ্বারা সৃষ্টি করি এবং আগামী পুত্র প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধেও বর্তমানেই নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা কল্পিত হতে দেখা যায়। সুতরাং তাদাত্ম্য বা কার্যকারণভাব না থাকায় নাম ও অর্থের পরস্পর বাস্তব কোন সম্বন্ধই নেই। এই কারণেই অর্থপ্রকাশক যে প্রত্যক্ষজ্ঞান তাতে বাচক নামের প্রকাশ হতে পারে না।

চার প্রকার প্রত্যক্ষাভাস—প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদটি ব্যবহারের দ্বারা দিঙ্‌নাগ একদিকে যেমন প্রত্যক্ষকে অন্যব্যাবৃত্ত করেছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে অনুমানাদি থেকে পৃথক করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিপ্রতিপত্তির নিরাকরণ করেছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মতকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত থেকে পৃথক করেছেন। এ প্রসঙ্গে *প্রমাণসমুচ্চয়* গ্রন্থে তিনি

চার প্রকার প্রত্যক্ষাভাসের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—(১) ভ্রান্তি, (২) সংবৃতিসৎ বস্তুর জ্ঞান, (৩) অনুমান, আনুমানিক, স্মার্ত ও আভিলাষিক জ্ঞান এবং (৪) তিমির।[xxiv] এদের মধ্যে কোনটাই প্রত্যক্ষ নয়, কেননা এগুলি কল্পনাপোঢ় নয়। এদের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার জ্ঞান কল্পনাজন্য, আর চতুর্থটি ইন্দ্রিয়ের ত্রুটিজন্য।

(১) ভ্রান্তি— ভ্রান্তি জ্ঞান প্রসঙ্গে *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*-তে দিঙ্‌নাগ বলেছেন, ভ্রান্তি জ্ঞান যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়, কেননা এটি কল্পনাজন্য। যেমন—মরুভূমিতে মরীচিকাতে জলজ্ঞান। এটি প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস।[xxv]

(২) সংবৃতিসৎ বস্তুর জ্ঞান—সংবৃতিসৎ বস্তুর জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, কেননা এটিও কল্পনাজন্য।[xxvi] যেমন—এটা পীতশঙ্খ। এই প্রকার জ্ঞান নাম, জাতি ইত্যাদি যুক্ত জ্ঞান। কিন্তু দিঙ্‌নাগ সম্প্রদায়ে প্রত্যক্ষ কেবল স্বলক্ষণ (বিশেষ) বস্তুরই হয়, সামান্য-বিশেষযুক্ত বস্তু এ মতে কল্পিত, সংবৃতিসৎ। সুতরাং সংবৃতিসৎ বস্তুর জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস।

(৩) অনুমান, আনুমানিক, স্মার্ত ও আভিলাষিক জ্ঞান—লিঙ্গের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস। ধূমকে লিঙ্গরূপে দর্শন, পূর্বানুভূতি ছাড়া হয় না। তাই এটি প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস।[xxvii] এখানে অনুমান বলতে অনুমিতির লিঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। আর আনুমানিক জ্ঞান হল অনুমান-জন্য জ্ঞান, অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ লিঙ্গের দ্বারা যে লিঙ্গীর জ্ঞান হয় সেটিও প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস। স্মার্ত জ্ঞান হল স্মৃতিজ্ঞান, আর আভিলাষিক জ্ঞান হল ইচ্ছাজনিত জ্ঞান। স্মার্ত ও আভিলাষিক জ্ঞানও প্রত্যক্ষাভাস।

(৪) তিমির—তিমির একধরনের চোখের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা একটি বস্তুকে দুটো করে দেখে। একটি চাঁদকে দুটো চাঁদ দেখে। এই দ্বিচন্দ্র দর্শন অবশ্যই প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস। তাই তিমির রোগের উপস্থিতি থাকলে চোখের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেটি প্রত্যক্ষাভাস।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, অক্ষ বা ইন্দ্রিয় এবং বিষয়—উভয়ের উপর নির্ভর করেই তো প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে অক্ষ (ইন্দ্রিয়)–এর নামানুসারে প্রত্যক্ষ বলা হয় কিন্তু বিষয়ের নামানুসারে প্রতিবিষয় বলা হয় না কেন? এর উত্তরে দিঙ্‌নাগ বলেছেন, ইন্দ্রিয় হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অসাধারণ কারণ, আর বিষয় হল সাধারণ কারণ। এই কারণে একে প্রত্যক্ষ বলা হয়, প্রতিবিষয় বলা হয় না।[xxviii] যখন কোন ব্যক্তির রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় তখন সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ অবশ্যই তার নিজের চক্ষুরিন্দ্রিয়, যেহেতু ঐ রূপাদি বিষয় অপর ব্যক্তিরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ এবং ঐ ব্যক্তির এবং অপর ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানের কারণ। তাই এক্ষেত্রে রূপাদি বিষয় হল সাধারণ কারণ। যেমন—'যবাঙ্কুর' শব্দটি এক বিশেষ ধরনের অঙ্কুরকে নির্দেশ করে। একে আমরা কখনই পৃথিব্যঙ্কুর বলবো না, যদিও পৃথিবী এখানে হেতু হচ্ছে।

এই একই যুক্তি আচার্য বসুবন্ধুও দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি আরেকটি যুক্তি দিয়েছেন, সেটি হল—ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতার তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিশালী হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্পষ্ট হয়, আর ইন্দ্রিয় দুর্বল হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হয়। এই কারণে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় বলা হয়। এই দুটি কারণে প্রত্যক্ষের নামকরণ অক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের নামানুসারে করা হয়, বিষয়ের নামানুসারে করা হয় না।

আবার আচার্য ধর্মকীর্তি বলছেন যে, কোন বিষয়ের নাম নির্ধারিত হয় তার গমক অনুযায়ী। অক্ষ বা ইন্দ্রিয় হল প্রত্যক্ষের গমক। তাই অক্ষ (ইন্দ্রিয়)-এর নামানুসারে প্রত্যক্ষ নামকরণ করা হয়েছে।

ধর্মকীর্তির মতে প্রত্যক্ষ—দিঙ্‌নাগের উত্তরসূরী আচার্য ধর্মকীর্তি *ন্যায়বিন্দু*-র প্রত্যক্ষসূত্রে দিঙ্‌নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণটি গ্রহণ করে তাতে 'অভ্রান্তত্ব' বিশেষণটি যুক্ত করে বলেছেন, 'তত্র কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্', অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল সেই জ্ঞান যেটি কল্পনাপোঢ় ও অভ্রান্ত।[xxix] অথবা বলা যায়, যে জ্ঞানে কল্পনার স্থান নেই এবং যা ভ্রান্ত নয়, এরূপ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। ধর্মকীর্তি কৃত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি বুঝতে গেলে আমাদের লক্ষণে ব্যবহৃত প্রতিটি পদের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

'তত্র' পদের অর্থ—সূত্রের প্রথম পদটি হল 'তত্র'। এই পদটিতে 'সপ্তম্যাস্ত্রল'(অষ্টাধ্যায়ী ৫.৩.১০) এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে ত্রল্ প্রত্যয় হয়েছে। এই সপ্তমীটি নির্ধারণে সপ্তমী হয়েছে।[xxx] নির্ধারণ হচ্ছে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞার দ্বারা কোনো সমুদয় থেকে তার কোনো অংশকে পৃথক করা। নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে প্রত্যয়টি হওয়ার জন্য 'তত্র' পদের মানে 'তার মধ্যে' অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে'। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটিই হল এখানে সমুদয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সমুদয় থেকে যে অংশ বা একদেশকে পৃথক করে নেওয়া হল সেটা হল প্রত্যক্ষ।[xxxi]

বিনীতদেব-এর মতে লক্ষণস্থ 'প্রত্যক্ষম্' পদটি হচ্ছে সংজ্ঞা, এবং 'কল্পনাপোঢ়ম্' ও 'অভ্রান্তম্'—এই দুটি হল সংজ্ঞী। সংজ্ঞা মানে 'নাম' এবং সংজ্ঞী মানে 'যার নাম আছে' অর্থাৎ 'নামযুক্ত বস্তু'। কিন্তু এদের মধ্যে এভাবে সংজ্ঞা-সংজ্ঞী-সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হলে প্রত্যক্ষের স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। এজন্য আচার্য ধর্মোত্তর উদ্দেশ্য-বিধেয়রূপে এদের গ্রহণ করে বিধেয় অংশের দ্বারা উদ্দেশ্যের স্বরূপটি পরিস্ফুট করেছেন।

ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি থাকলে যে জ্ঞান হয় এবং ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি না থাকলে যে জ্ঞান হয় না এরকম সাক্ষাৎকারী জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষ' শব্দের বাচ্য। ঐরকম জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করেই 'কল্পনাপোঢ়' ও 'অভ্রান্ত' বিশেষণ দুটো প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে শঙ্কা হতে পারে, ঐরকম প্রত্যক্ষ যদি ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বারা বোঝানো হয়, তাহলে যোগীর প্রত্যক্ষে তো ঐ নিয়ম খাটবে না, কারণ যোগীর প্রত্যক্ষে তো ঐরকম ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নেই। তাই প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যবহার ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারের চেয়েও যে ব্যাপক, তা স্পষ্ট। তাহলে যে, ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কথা আনা হয়েছে তার কারণ হল—কোনো লোক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উদাহরণ থেকে সব সাক্ষাৎকারী জ্ঞানের স্বরূপ যাতে সহজে বুঝতে পারে তার জন্য। তাই ঐ সাক্ষাৎকারী জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে কল্পনাপোঢ়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব এই দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ধর্মকীর্তি। এই দুটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষের ব্যাবর্তক ধর্ম অর্থাৎ এই দুটি ধর্মের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্য প্রমাণ থেকে পৃথক।

কল্পনাপোঢ় পদের অর্থ—প্রত্যক্ষ প্রমাণের একটি বৈশিষ্ট্য হল কল্পনাপোঢ়ত্ব। 'কল্পনাপোঢ়ম্' এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হল 'কল্পনায়া অপোঢ়ম্'। 'অপোঢ়ম্' মানে অপেত, শূন্য, রহিত ইত্যাদি।[xxxii] সুতরাং 'কল্পনাপোঢ়ম্' কথার অর্থ হল কল্পনাশূন্য বা কল্পনারহিত। এককথায়, যেটি কল্পনা জ্ঞান নয় বা কল্পনা জ্ঞানের যে স্বভাব সেই স্বভাব যে জ্ঞানে নেই সেই জ্ঞানকে কল্পনাপোঢ় বলা হয়।[xxxiii] তাহলে এখন প্রশ্ন হয়, কল্পনা বলতে কি বোঝায়? এ প্রসঙ্গে আচার্য ধর্মকীর্তি *ন্যায়বিন্দু* গ্রন্থে কল্পনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এভাবে, 'অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসা প্রতীতিঃ কল্পনা' অর্থাৎ অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাস প্রতীতি হল কল্পনা।[xxxiv] এখন প্রশ্ন, অভিলাপ বলতে কি বোঝায়? 'অভিলপ্যতে অনেন ইতি অভিলাপঃ'—এভাবে ব্যুৎপত্তি করে অভি-লপ্ ধাতুর করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করে 'অভিলাপ' শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে, যার অর্থ বাচক শব্দ।[xxxv] বাচক শব্দের সাহায্য ছাড়া আমরা অভিমত অর্থকে অপরের কাছে উপস্থাপন করতে পারি না। সুতরাং যে নাম বা সংজ্ঞা যে অর্থের বাচক, সেই নাম বা সংজ্ঞাটিই অর্থের সেই অভিলাপ। অভিলাপের সাথে সংসর্গ হল অভিলাপসংসর্গ।[xxxvi] যখন একটি জ্ঞানে অভিধেয় বস্তুর আকার ও অভিধানের আকার অর্থাৎ বাচক শব্দের আকার গ্রাহ্যাকারে মিলিত হয়, তখন ঐ মিলনকে অভিলাপসংসর্গ বলা হয়।[xxxvii] যখন আমরা প্রথমেই কোনো ঘটকে দেখি তখন সেই ঘটের আকারটি আমাদের জ্ঞানে আসে। এর দু-একক্ষণ পরেই আমরা সামনের দৃশ্যমান্ বস্তুকে 'ঘট' বলে সম্বোধন করি। এই সময় যে জ্ঞানটি হয় সেটি

সেই প্রথম ক্ষণের জ্ঞানের মতো নয়। যেহেতু এই জ্ঞানে দুটি আকার বিষয় হয়—একটি হল অভিধেয় ঘটের আকার এবং অন্যটি হল বাচক ঘটের আকার অর্থাৎ 'ঘট' বলে যে শব্দটি উচ্চারণ করি তার আকার। জ্ঞানকে শব্দের দ্বারা অভিহিত করলে, ঐ জ্ঞানে অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্যের আকারটি বাচক শব্দের আকারের সাথে মিশে যায়। এই মিলনকে বলা হয় অভিলাপসংসর্গ। শব্দের দ্বারা জ্ঞানকে অভিহিত করলে জ্ঞানটি তখন আর কেবল বস্তুর শুদ্ধ রূপকে (শুদ্ধ অভিধেয় বস্তুর আকারকে) বহন করে না, পরন্তু বাচক শব্দের আকারের (অভিধানের আকারের) সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অবস্থান করে বলে শব্দসংসর্গযোগ্য 'বস্তুর সামান্যাকার'কে গ্রহণ করে; অর্থাৎ 'ঘট' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যুক্ত হলে জ্ঞানটি তখন ঘট থেকে ভিন্ন যে বিজাতীয় যাবৎ বস্তু, সেই সকল বস্তু থেকে ভিন্ন সম্মুখস্থ ঘট—এভাবে বস্তুর সামান্যরূপকেও বিষয় করে। যখন একটি জ্ঞানে অভিধেয় ও অভিধানের আকার সন্নিবিষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে, অভিধেয় ও অভিধান পরস্পর সংসৃষ্ট হয়েছে।[xxxviii]

জ্ঞানে অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য বস্তুর আকারের প্রতিভাসটি অভিধানের অর্থাৎ বাচক শব্দের আকারের প্রতিভাসের দ্বারা বিশিষ্ট হয় বলে অভিধেয় (বস্তু) ও অভিধানের (শব্দের) মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়। তাই শব্দ-সংসৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে অবশ্যই সবিকল্পক জ্ঞান বলতে হবে। এই প্রকার জ্ঞানই কল্পনা। এই কারণে ধর্মকীর্তি বলেছেন, যে জ্ঞানে বস্তুর আকারের প্রতিভাস শব্দসংসর্গের যোগ্য হয়, সেই প্রতিভাসকে কল্পনা বলা হয়।

যখন কোনো ব্যক্তি সম্মুখস্থ কোনো ঘটকে 'এটা ঘট' এইভাবে জানে, তখন সেই ব্যক্তির শব্দ-সংসৃষ্ট প্রতিভাসযুক্ত জ্ঞান হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন ঐ ব্যক্তি ব্যুৎপন্নসঙ্কেত হয় অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-নির্দেশরূপ সঙ্কেত জানে, তারই ঘট বস্তুতে কল্পনা অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞান হতে পারে। আর এরূপ কল্পনাতে ঘট-শব্দ-সংসৃষ্ট ঘটের আকারের প্রতিভাস দেখা যায়।[xxxix] প্রতিভাসের সাথে ঘট-শব্দ-সংসৃষ্ট হয় মানে ঘটের আকারটি ঐ 'ঘট' শব্দের আকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে বালক অব্যুৎপন্নসঙ্কেত অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-নির্দেশরূপ সঙ্কেত জানে না, সে তো শব্দ প্রয়োগ করতে পারে না, তাই তার ঘট জ্ঞানে অভিলাপ-সংসর্গযুক্ত প্রতিভাস তো হতে পারে না। তবে ঐ বালকের জ্ঞানে অভিলাপ-সংসর্গযুক্ত প্রতিভাস না থাকলেও অভিলাপ-সংসর্গযোগ্য প্রতিভাস থাকে।[xl] সুতরাং বালকের কল্পনা হতে বাধা নেই। বালকের মতো মূক (বোবা), সদ্যোজাত, এমনকি শব্দ উচ্চারণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরও কল্পনা হতে পারে। এই কারণে আচার্য ধর্মকীর্তি 'অভিলাপ সংসর্গযুক্ত প্রতিভাস প্রতীতি'কে কল্পনার লক্ষণ না বলে 'অভিলাপ সংসর্গযোগ্য প্রতিভাস প্রতীতি'কে কল্পনার লক্ষণরূপে মেনেছেন। যা শব্দসংসর্গযুক্ত হয়, তা অবশ্যই শব্দসংসর্গযোগ্য হবে, কারণ কোন কিছু তদ্‌যোগ্য না হলে তদ্‌যুক্ত হতে পারে না। এই কারণে আচার্য ধর্মকীর্তি কল্পনার লক্ষণে 'যোগ্য' শব্দের নিবেশ করে শব্দসংসর্গযুক্ত প্রতিভাস ও শব্দসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস—এই দুপ্রকার জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন।

'অভ্রান্ত' পদের অর্থ—এরপর আচার্য ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করেছেন, তা হল অভ্রান্তত্ব। সাধারণভাবে যে জ্ঞানটি ভ্রান্ত নয় তাকেই বলে অভ্রান্ত। তবে আচার্য ধর্মোত্তর *ন্যায়বিন্দুটীকা*-তে 'অভ্রান্ত' শব্দের অর্থ করেছেন এভাবে, 'অর্থক্রিয়াক্ষমে বস্তুরূপেঽবিপর্যস্তম্', অর্থাৎ যে জ্ঞান বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপের বিপরীত হয় না তাই অভ্রান্ত।[xli] এখন প্রশ্ন হল, বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে আচার্য ধর্মোত্তর বলছেন, বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপটা হল সন্নিবেশ-উপাধি-বর্ণাত্মক।[xlii] সন্নিবেশ মানে গঠনবিশেষ বা আকারবিশেষ, উপাধি মানে বিশেষণ, বস্তু শব্দের দ্বারা যাকে বোঝানো হয় তাকেই বলে বর্ণ। বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট হয়, যেমন- গোল, চৌকো ইত্যাদি। বস্তুর বিশেষ বিশেষ আকারকেই গঠনবিশেষ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। বস্তুর এই যে বিশেষ বিশেষ গঠন বা আকার, এগুলি বস্তুর বাস্তবিক ধর্ম নয়, প্রাতিভাসিক ধর্ম। এ জন্যই এসব ধর্মকে উপাধি বলা হয়েছে। বিশেষ প্রকার সন্নিবেশের জন্য রূপাদি পরমাণু ঘটাদি রূপে জলবহন ইত্যাদি অর্থক্রিয়াতে সমর্থ হয়। সুতরাং গঠন-বিশেষরূপ উপাধিবিশিষ্ট বস্তুস্বভাবই হচ্ছে বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ, গঠন-বিশেষ বিশিষ্ট পরমাণুরূপ। সংঘাতই হচ্ছে বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ, এছাড়া অন্য কিছু নয়।

বৌদ্ধমতে পরমাণু অতীন্দ্রিয় নয়। ইন্দ্রিয়গোচর সূক্ষ্মতম কণাই হল পরমাণু। এই যে গঠনবিশেষ-বিশিষ্ট পরমাণুসংঘাত তাকেই অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুরূপ বলা হয়েছে। পরমাণুগুলি সন্নিবেশ-বিশেষের কারণেই জলবহনাদি অর্থক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। তাই ঘটের পরমাণু-প্রচয়েরই অর্থক্রিয়াকরণে সামর্থ্য স্বীকার করতে হবে। এই যে বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ—এই রূপটি অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে থাকতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানটি বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপের বিপরীত হয়ে যেতে পারে। যেমন- স্থির জলে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করার সময় স্থলের গাছপালাকে চলমান বলে জ্ঞান হয়। আবার তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একটি চাঁদকে দুটি চাঁদ দেখে। এই জ্ঞানগুলির কোনটাকেই অভ্রান্ত বলা যায় না। কেননা তাদের প্রকৃত রূপকে জ্ঞান দেখাতে পারে না। প্রত্যক্ষে এই ধরনের ভ্রান্তি নানা কারণে হয়ে থাকে। আচার্য ধর্মকীর্তি *ন্যায়বিন্দু* গ্রন্থে ভ্রান্তির চাররকম কারণ দেখিয়েছেন। যেমন- ইন্দ্রিয়গত, বিষয়গত, বাহ্যাশ্রয়গত এবং আধ্যাত্মিক।[xliii]

ইন্দ্রিয়গত কারণে ভ্রান্তি—তিমির একপ্রকার চোখের রোগ, একে অক্ষিদ্বয়ের বিপ্লব বা বিকার বলা হয়েছে।[xliv] এই ধরনের রোগীরা ইন্দ্রিয়গত বিকলতার কারণে যে একটি চাঁদে দুটো চাঁদ দেখে, সেই দ্বিচন্দ্র দর্শন অবশ্যই প্রত্যক্ষ নয়। এখানে ভ্রান্তির কারণ ইন্দ্রিয়গত।[xlv] এই ধরনের জ্ঞান কল্পনাপোঢ় হলেও তা ভ্রান্ত।

বিষয়গত কারণে ভ্রান্তি—আশুভ্রমণের কারণে বিষয়গত ভ্রান্তি হয়। আশুভ্রমণ মানে দ্রুত ঘূর্ণন। একটি মশালের দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে সেটিকে একটি আগুনের চাকা বলে মনে হয়।[xlvi] বস্তুতপক্ষে সেটা তো চাকা নয়। মশালটি আস্তে ঘুরালে কখনই চাকার ভ্রম উৎপন্ন হয়না।[xlvii] চক্রভ্রান্তির ক্ষেত্রে বাচক শব্দের যোগ না থাকলেও সেটি প্রত্যক্ষ (প্রমাণ) নয়। এখানে মশাল হচ্ছে বিষয়, যেটি চক্রাকারের প্রতি নিমিত্ত হয়।

বাহ্যাশ্রয়গত কারণে ভ্রান্তি—স্থির জলে দ্রুতগামী নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করার সময় তীরের গাছগুলিকে চলমান বলে মনে হয়। কিন্তু মন্দগামী নৌকায় উপবিষ্ট লোকের এরকম চলমান বৃক্ষের জ্ঞান হয়না। গাছ তো চলমান হতে পারে না, তাই ঐরকম বিষয়যুক্ত জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান। সুতরাং এক্ষেত্রে চলমান বৃক্ষের যে প্রত্যক্ষ হয় সেখানে বাচক শব্দের যোগ না থাকলেও সেটি প্রমাণ হতে পারে না। এখানে ভ্রান্তির কারণটা হচ্ছে বাহ্যাশ্রয়গত অর্থাৎ বাহ্য হচ্ছে নৌকা, নৌকারূপ আশ্রয়। সেখানে অবস্থিত লোকের—আশ্রয় দ্বারা ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়েছে। লোকটি ঐরকম আশ্রয়ে আছে বলেই ভ্রান্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক কারণে ভ্রান্তি—সংক্ষোভ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপের ফলে শরীরে যে বৈষম্য উৎপন্ন হয় তার প্রভাবে জ্বলন্ত স্তম্ভ দর্শনের যে সকল জ্ঞান হয় সেগুলি আধ্যাত্মিক কারণে উৎপন্ন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ।[xlviii]

ইন্দ্রিয়গত, বিষয়গত, বাহ্যাশ্রয়গত বা আধ্যাত্মিক ভ্রমের এই সকল কারণ ইন্দ্রিয়কে বিকৃত করে ভ্রম উৎপন্ন করে। অবিকৃত ইন্দ্রিয় থেকে ভ্রম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং যে জ্ঞান কল্পনারহিত এবং যে জ্ঞানে তিমির নামক চক্ষুরোগ, দ্রুত ঘূর্ণন, নৌকায় গমন, তথা বাত প্রভৃতির প্রকোপ ও আরো অন্যান্য কারণ থেকে উৎপন্ন ভ্রান্তি থাকে না, সেই জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ।[xlix]

(তিন)

সিদ্ধান্তানুগ পর্যবেক্ষণ : বর্তমান আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধমতে একমাত্র নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষজ্ঞান পদবাচ্য; সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, যা বৌদ্ধ পরিভাষায় কল্পনা নামে অভিহিত, তা প্রত্যক্ষজ্ঞান পদবাচ্য নয়—একথা সকল বৌদ্ধ দার্শনিকগণই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত।

তবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যেমন- বসুবন্ধুর মতে প্রত্যক্ষ হল এমন একপ্রকার জ্ঞান যা অর্থ বা বিষয় থেকে উৎপন্ন হয়। আবার দিঙ্‌নাগের মতে প্রত্যক্ষ হল এমন জ্ঞান যা কল্পনারহিত। আবার ধর্মকীর্তির মতে প্রত্যক্ষ হল এমন জ্ঞান যা কল্পনারহিত ও অভ্রান্ত। সুতরাং দেখা যায় যে, বসুবন্ধু প্রত্যক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন মুখে লক্ষণ বর্ণনা করে নাই, পরন্তু তিনি কারণ বর্ণনা মুখেই লক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। অন্যদিকে, দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের কারণ প্রতিপাদনের দ্বারা লক্ষণ প্রতিপাদন করেননি, পরন্তু স্বরূপ প্রতিপাদন মুখেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

আবার দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি উভয়েই প্রত্যক্ষকে কল্পনাপোঢ় বললেও কল্পনার স্বরূপ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে। দিঙ্‌নাগের মতে কল্পনা হল অর্থের সঙ্গে নাম-জাতি ইত্যাদির যোজনা। আর ধর্মকীর্তির মতে কল্পনা হল অভিলাপ সংসর্গযোগ্য প্রতিভাসা প্রতীতি। অর্থাৎ যে জ্ঞানে বস্তুর আকারের প্রতিভাস শব্দ সংসর্গের যোগ্য হয়, সেরূপ প্রতিভাসই কল্পনা। এ মতে অভিলাপসংসর্গযুক্ত প্রতিভাস প্রতীতি যেমন কল্পনা, অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস প্রতীতিও তেমনি কল্পনা। অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস প্রতীতিকে কল্পনা বলাতে শিশু ও মূক ব্যক্তির কল্পনাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দব্যবহার জানা না থাকায় শিশু ও মূক ব্যক্তির যে কেবল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় না, এমন নয়। তারা যখন একটি দৃশ্যমান বস্তুকে পূর্বদৃষ্ট বস্তুরূপে দেখে, তখন তাদের জ্ঞানটি কল্পনাযুক্ত হওয়ায় (শব্দসংসর্গযুক্ত না হলেও) শব্দসংসর্গযোগ্য হয়। তাই শিশু ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানে অভিলাপসংসর্গযুক্ত প্রতিভাস না থাকলেও অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস থাকে। তাই ধর্মকীর্তির মতে অভিলাপসংসর্গযোগ্য এবং অভিলাপসংসর্গযুক্ত—উভয় প্রকার প্রতিভাস প্রতীতিই হল কল্পনা।

আবার কল্পনার প্রকারভেদ নিয়েও দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির মধ্যে মতভেদ আছে। দিঙ্‌নাগের মতে কল্পনা পাঁচ প্রকার—নামকল্পনা, জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা এবং দ্রব্যকল্পনা। অন্যদিকে ধর্মকীর্তির মতে সব মিলিয়ে একপ্রকারই কল্পনা, তা হল নামকল্পনা। *প্রমাণবিনিশ্চয়* গ্রন্থে ধর্মকীর্তি বলছেন যে, 'অভিলাপিনী প্রতীতিঃ কল্পনা' অর্থাৎ যে প্রতীতিকে নাম বা শব্দ দিয়ে ডাকা যায় সেটাই হল কল্পনা। নাম বা শব্দের দ্বারাই জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য অর্থ বোঝা যায়। তাই আচার্য ধর্মকীর্তি কেবল নামকল্পনাকেই মেনেছেন।

আচার্য ধর্মকীর্তির মতে প্রত্যক্ষ হল সেই জ্ঞান যা কল্পনাপোঢ় ও অভ্রান্ত। তাঁর মতে কেবলমাত্র কল্পনাপোঢ়ত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে সূচিত করলে তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রের জ্ঞান, চলমান যান থেকে স্থির বৃক্ষকে চলমান বৃক্ষরূপে দর্শন ইত্যাদি ভ্রান্ত জ্ঞানও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত হয়ে যাবে, কেননা এই জ্ঞানগুলি সবই কল্পনাশূন্য। এজন্য ধর্মকীর্তির মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদটি সংযোজন করা আবশ্যক। কিন্তু আচার্য দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদটি প্রয়োগ করেননি। তিনি কেবলমাত্র কল্পনাপোঢ়ত্বকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে সূচিত করেছেন। তাহলে দিঙ্‌নাগ কি 'অভ্রান্ত' পদটির অপ্রয়োগে যে অনিষ্ট সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে সেটির সম্বন্ধে জানতেন না? নাকি, তিনি সচেতনভাবেই 'অভ্রান্ত' শব্দটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জন করেছেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে, দ্বিতীয় মতটিই ঠিক। আসলে দিঙ্‌নাগ ছিলেন যোগাচারবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক। এই মতে জ্ঞানই একমাত্র বাস্তব, জ্ঞানের বাইরে বাহ্যবস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। দিঙ্‌নাগের মতে, কল্পনা থেকেই ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। যে জ্ঞানে কল্পনা থাকে না তা অভ্রান্ত হয়। তাই বলা যায় যে, নির্বিকল্পক বা কল্পনাশূন্য

জ্ঞান অভ্রান্ত হয় বলে 'অভ্রান্ত' পদ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই 'অভ্রান্ত' পদটি প্রয়োগ না করার পিছনে আরো কারণ আছে। যোগাচারবাদীরা মনে করেন যে, 'সর্বমালম্বনে ভ্রান্তং মুক্ত্বা তথাগতজ্ঞানম্' অর্থাৎ বুদ্ধের জ্ঞান ভিন্ন সকল জ্ঞানই আলম্বনে ভ্রান্ত। আমাদের যে সমস্ত জ্ঞান নয়, সেই জ্ঞান যাকে নিয়ে হয় সেই বস্তুর প্রকৃত বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই, অথচ সেটি জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান আলম্বনে ভ্রান্ত। তাহলে জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলা যাবে কিভাবে? তাই যোগাচার মতে 'অভ্রান্ত' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না। 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্' বললেই তার দ্বারা দ্বিচন্দ্র, স্বপ্নজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সবই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে বাদ যাবে।

তথ্যসূত্র:

[i] 'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ'। *ন্যায়বিন্দু,* আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী সম্পাদিত, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০১৪, প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ৩ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ১১

[ii] 'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্।
প্রমেয়ং তৎ প্রয়োগার্থং ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ'।।
Pramāṇa Samuccaya, Diṅnāga, Ed. by H. R. Rangaswamy Iyengar, Mysore University Publication, Mysore, 1930, Pratyakṣapariccheda, Sūtra 2, p.4

[iii] *Pramāṇavārttika,* Acharya Dharmakirtti, Ed. by Swami Dwarikadas Shastri, Bauddha Bharati, Varanasi, 1968, Dvitīyapariccheda—Pratyakṣa, Sūtra 1, p.98

[iv] 'তস্য বিষয়ঃ স্বলক্ষণম্'। *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ১২ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ২১

[v] 'স্বম্ অসাধারণং লক্ষণং তত্ত্বং স্বলক্ষণম্'। *Nyāyabindu-Tīkā,* Dharmottara Āchārya, Ed. by Peter Peterson, The Asiatic Society, Calcutta, 1929, Pratyakṣapariccheda, p.15

[vi] *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ১৩ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ২২

[vii] 'অর্থস্য প্রয়োজনস্য ক্রিয়া নিষ্পত্তিঃ'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১৭

[viii] 'অর্থক্রিয়া সামর্থ্যলক্ষণত্বাদ্ বস্তুনঃ'। *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ১৫ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ২৩

[ix] 'অন্যৎ সামান্য লক্ষণম্'। *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ১৬ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ২৪

[x] *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১৭

[xi] 'সোঅনুমানস্য বিষয়ঃ'। *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, ১৭ নং সূত্র, পৃষ্ঠা ২৪

[xii] প্রমাণসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত বাদবিধি বাক্য। *প্রমাণসমুচ্চয়,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৩৪

[xiii] 'যদ্বিজ্ঞানং যেন বিষয়েণ ব্যপদিশ্যতে তৎ তন্মাত্রাদুৎপদ্যতে। নান্যতঃ। ততোঽন্যতশ্চ ন ভবতীতি তজ্জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'। তদেব পৃষ্ঠা ৩৪

[xiv] *প্রমাণসমুচ্চয়,* আচার্য দিঙ্নাগ, প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, সূত্র নং ৩, পৃষ্ঠা ৮

[xv] 'লক্ষ্যমিদম্। কল্পনাপোঢ়মিতি লক্ষণম্'।
Pramāṇa Samuccaya Vṛtti, Diṅnāga, Ed. by H. R. Rangaswamy Iyengar, Mysore University Publication, Mysore, 1930, Pratyakṣapariccheda, p.9

[xvi] 'অথ কল্পনা চ কীদৃশীচেদাহ। নামজাত্যাদিযোজনা'। *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১২

[xvii] 'যদৃচ্ছাশব্দেষু নাম্নাবিশিষ্টোঽর্থ উচ্যতে ডিত্থ ইতি। জাতিশব্দেষু জাত্যা গৌরিয়মিতি। গুণশব্দেষু গুণেন শুক্ল ইতি। ক্রিয়াশব্দেষু ক্রিয়য়া পাচক ইতি। দ্রব্যশব্দেষু দ্রব্যেণ দণ্ডী বিষাণীতি'। তদেব পৃষ্ঠা ১২

[xviii] 'যত্র জ্ঞানে কল্পনা নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষম্'। *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১২

[xix] 'নামজাত্যাদীনাং চ যা যোজনা তদ্বদ্ভিঃ, সাঽর্থগতো ধর্মঃ, ন জ্ঞানস্য; ততশ্চাপ্রস্তুতাভিধায়িত্বং লক্ষণকারস্য?'
Tattvasaṅgraha-pañjikā, Shri Kamalshīla, commentary on karika 1221 of Ācārya Śāntarakṣita; quoted in the Tattvasaṅgraha*,* Śāntarakṣita, (with the commentary of Kamalshīla), edited by Swami Dwarikadas Shastri, Bauddha Bharati, Varanasi, 1968, p. 451

[xx] 'অন্যেষাং চ স্বলক্ষণাদীনাং বাহ্যানাং বাচ্যত্বেনাযোগস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ'। *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা,* শ্রী কমলশীল কৃত, সপ্তদশ অধ্যায়-প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা, কারিকা ১২১৭, পৃষ্ঠা ৪৫০

[xxi] 'নামাদিযোজনা চেয়ং স্বনিমিত্তমনন্তরম্। আক্ষিপ্য বর্ত্ততে যেন তেন নাপ্রস্তুতাভিধা'। *Tattvasaṅgraha,* Ācārya Śāntarakṣita, Ed. by Swami Dwarikadas Shastri, Bauddha Bharati, Varanasi, 1968, Chapter xvii, kārikā 1221, p. 452
'নামাদীনাং যোজনা যতো ভবতি সা তথোক্তা। গমকত্বাদ্ বৈয়ধিকরণ্যেঽপি চ বহুব্রীহিঃ'। *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা,* সপ্তদশ অধ্যায়-প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা, কারিকা ১২২১, পৃষ্ঠা ৪৫২

[xxii] 'ননু চ যদি প্রতীতিরভিলাপিনী কল্পনা, সা ধর্মিণী, ন চ ধর্ম্যন্তরে ধর্ম্যন্তরস্য প্রসঙ্গঃ, যেন তন্নিষেধস্তদ্ধর্মতয়া ক্রিয়ত ইত্যসম্বন্ধাভিধানম্'। *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা,* সপ্তদশ অধ্যায়-প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা, কারিকা ১২৩৮, পৃষ্ঠা ৪৫৭

[xxiii] 'এবং প্রতীতরূপা চ যদেবং কল্পনা মতা। তাদাত্ম্যপ্রতিষেধশ্চ প্রত্যক্ষস্যোপবর্ণ্যতে'।। *তত্ত্বসংগ্রহ,* সপ্তদশ অধ্যায়-প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা, কারিকা ১২৩৮, পৃষ্ঠা ৪৫৭
'যত্রৈষা কল্পনা নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষম্ ইত্যনেন গ্রন্থেন লক্ষণকারস্তাদাত্ম্যপ্রতিষেধং করোতি। এবম্ভূতং কল্পনাত্মকং যজ্জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ'। *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা,* সপ্তদশ অধ্যায়-প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা, পৃষ্ঠা ৪৫৭

[xxiv] 'ভ্রান্তিঃ সংবৃতিসজ্জ্ঞানমনুমানানুমানিকম্। স্মার্তাভিলাষিকং চেতি প্রত্যক্ষাভং সতৈমিরম্'।। *প্রমাণসমুচ্চয়,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, সূত্র ৮, পৃষ্ঠা ২০

[xxv] 'অথ মরীচিকাদিষু জলাদিকল্পনাৎ ভ্রমজ্ঞানং প্রত্যক্ষাভাসম্'। *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২১

[xxvi] 'সংবৃতিসত্যং হি স্বস্মিন্ অর্থান্তরমারোপ্য তৎ স্বরূপকল্পনাৎ প্রত্যক্ষাভাসম্'। তদেব পৃষ্ঠা ২১

[xxvii] 'অনুমানং তৎফলং চ পূর্বানুভবকল্পনাৎ ন প্রত্যক্ষম্'। তদেব পৃষ্ঠা ২১

[xxviii] 'অসাধারণহেতুত্বাদ্ব্যপদেশ্যং তদিন্দ্রিয়ৈঃ। তত্রনৈকার্থতোৎপাদাৎ স্বার্থসামান্যগোচরঃ'।। *প্রমাণসমুচ্চয়,* প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, সূত্র ৪, পৃষ্ঠা ১৩

[xxix] *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, সূত্র ৪, পৃষ্ঠা ১২

[xxx] 'তত্রেতি সপ্তম্যর্থে বর্তমানো নির্ধারণে বর্ততে'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ৮

[xxxi] 'তত্র তয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানয়োরিতি সমুদায়নির্দেশঃ'। প্রত্যক্ষম্ ইত্যেকদেশনির্দেশঃ'। তদেব পৃষ্ঠা ৮

[xxxii] 'কল্পনায়া অপোঢ়মপেতং কল্পনাপোঢ়ম্'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ৮

[xxxiii] 'কল্পনাস্বভাবরহিতমিত্যর্থঃ'। তদেব পৃষ্ঠা ৮

[xxxiv] *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, সূত্র ৫, পৃষ্ঠা ১৫

[xxxv] 'অভিলপ্যতেঽনেনেতি অভিলাপো বাচকঃ শব্দঃ'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১০

[xxxvi] 'অভিলাপেন সংসর্গঃ অভিলাপসংসর্গঃ'। তদেব পৃষ্ঠা ১০

[xxxvii] 'একস্মিন্ জ্ঞানেঽভিধেয়াকারস্যাভিধানাকারেণ সহ গ্রাহ্যাকারতয়া মীলনম্'। তদেব পৃষ্ঠা ১০

[xxxviii] 'ততো যদৈকস্মিন্ জ্ঞানেঽভিধেয়াভিধানয়োরাকারৌ সন্নিবিষ্টৌ ভবতস্তদা সংসৃষ্টে অভিধানাভিধেয়ে ভবতঃ'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১০

[xxxix] 'তত্র কাচিৎ প্রতীতিরভিলাপেনসংসৃষ্টাভাসা ভবতি; যথা ব্যুৎপন্ন-সঙ্কেতস্য ঘটার্থকল্পনা ঘটশব্দসংসৃষ্টার্থাবভাসা ভবতি'। তদেব পৃষ্ঠা ১০

[xl] 'কাচিৎ ত্বভিলাপেনসংসৃষ্টাপি অভিলাপসংসর্গযোগ্যাভাসা ভবতি; যথা বালকস্যাব্যুৎপন্নসঙ্কেতস্য কল্পনা'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১০

[xli] *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ৮

[xlii] 'অর্থক্রিয়াক্ষমং চ বস্তুরূপং সন্নিবেশোপাধিবর্ণাত্মকম্'। তদেব পৃষ্ঠা ৮

[xliii] *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, সূত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৭

[xliv] 'তিমিরম্ অক্ষ্ণোর্বিপ্লবঃ'। *ন্যায়বিন্দুটীকা,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, পৃষ্ঠা ১২

[xlv] 'ইন্দ্রিয়গতমিদং বিভ্রমকারণম্'। তদেব পৃষ্ঠা ১২

[xlvi] 'আশুভ্রমণম্ অলাতাদেঃ'। তদেব পৃষ্ঠা ১২

[xlvii] 'মন্দং হি ভ্রাম্যমাণেঽলাতাদৌ ন চক্রভ্রান্তিরুৎপদ্যতে'। তদেব পৃষ্ঠা ১২

[xlviii] 'সংক্ষোভো বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্। বাতাদিষু হি ক্ষোভং গতেষু জ্বলিতস্তম্ভাদিভ্রান্তিরুৎপদ্যতে। এতচ্চাধ্যাত্মগতং বিভ্রমকারণম্'। তদেব পৃষ্ঠা ১২

[xlix] 'তিমিরাশু ভ্রমণ নৌযান সংক্ষোভাদ্যনাহিত বিভ্রমং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'। *ন্যায়বিন্দু,* প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ, সূত্র ৬, পৃষ্ঠা ১৭

গ্রন্থপঞ্জী:

1) আচার্য ধর্মকীর্তি। *ন্যায়বিন্দু*। সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ২০১৪
2) আচার্য ধর্মকীর্তি। *ন্যায়বিন্দু*। সম্পা. সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ। কলকাতা : সদেশ, ২০০৭
3) সায়ণ মাধবীয়। *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, মাঘ ১৩৫১
4) শাস্ত্রী, পঞ্চানন। *বৌদ্ধ দর্শনম্*। কলকাতা : গুপ্তপ্রেশ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
5) ত্রিপাঠী, দীননাথ। *মানমেয়োদয়ঃ*। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৯০
6) Dharmottara Āchārya. *Nyāyabindu-Tīkā.* Ed. by Peter Peterson. Calcutta : The Asiatic Society, 1929
7) Acharya Dharmakirtti. *Pramāṇavārttika.* Ed. by Swami Dwarikadas Shastri. Varanasi: Bauddha Bharati, 1968
8) Diṅnāga. *Pramāṇa Samuccaya with Vṛtti,Tīkā and Notes.* Ed. by H. R. Rangaswamy Iyengar. Mysore : Mysore University Publication, 1930
9) Hattori, Masaaki. *Dignāga, On Perception.* Cambridge : Harvard University Press, 1968
10) Shastri, Swami Dwarikadas. *Tattvasaṅgraha of Ācārya Śāntarakṣita with the commentary pañjikā of Shri Kamalshīla*. Vol.1. Varanasi : Bauddha Bharati, 1968
11) Jha, Ganganatha. *The Tattvasaṅgraha of Śāntarakṣita with the commentary of Kamalśīla.* Vol.1. Baroda : Oriental Institute, 1937
12) Stcherbatsky, F.Th. *Buddhist Logic.* vol.1, New York : Dover Publications, Inc, 1962
13) Stcherbatsky, F.Th. *Buddhist Logic.* vol.2, New York : Dover Publications, Inc, 1962